অন্ধকার থেকে আলোর পথে যাত্রা - আমার জীবনে ভগবদ্গীতার গভীর প্রভাব

আমরা ছয় বন্ধু প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে কলকাতার একটি স্কুলে একসাথে পড়াশুনা করেছিলাম।

এর পর জীবনের দায়িত্ব আর কর্তব্যপূরণ করার দৌড়ে আমরা পরস্পর থেকে অনেক দূরে চলে গিয়েছিলাম। কিন্তু এখন জীবনের অপরাহ্নে এসে, ঈশ্বরের আশীর্বাদে আর সোশ্যাল মিডিয়ার ইতিবাচক প্রভাবে, আমরা আবার একত্রিত হতে পেরেছি।

আমরা মাসে অন্তত একবার একটি জুম কল করি। এবং সেই আড্ডায় আমরা আমাদের জীবনের ছোট্ট আনন্দ, বড় হতাশা, বিশাল দুঃখ এবং অপূর্ণ ইচ্ছার দীর্ঘ তালিকা একে ওপরের সাথে শেয়ার করি।

এমনই এক আড্ডায়, যখন আমরা বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করছিলাম, তখন এক বন্ধু বলল যে এখন যখন ওর হাতে কিছু সময়ে আছে তখন ও ওর এক অপূর্ণ ইচ্ছা, সংস্কৃত ভাষা শিখতে চায়। আমাদের আরেক বন্ধু, যার আধ্যাতিক বিষয়ে আগ্রহ আছে, বললো গত পঁয়ত্রিশ বছর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করা সত্ত্বেও সনাতন হিন্দু ধর্মের দর্শন বোঝার জন্য ও গীতা পরিবারের ক্লাসে ভর্তি হয়েছে। তৎক্ষণাৎ ও আমাদের হোয়াটসঅ্যাপে রেজিস্ট্রেশন লিঙ্কটি পাঠায়ে হাসতে হাসতে বললো, 'দেখ নাস্তিকের দল, তোদের কোনো কাজে আসে কি না'।

আমি যেই হেতু তথ্যপ্রযুক্তির দুনিয়ার সাথে যুক্ত, আমি অবিলম্বে গীতা পরিবারের অ্যাপটি ডাউনলোড করি এবং গীতা শেখার কোনো ইচ্ছার না থাকা সত্ত্বেও কৌতূহল বসত নভেম্বর-২৩ এর L-1 ব্যাচে রেজিস্টার করি। কৌতূহলই আমাকে উদ্ঘাটন সমারোহে টেনে নিয়ে গিয়েছিলো। এখন ভাবি সেটা কৌতূহল ছিল না কৌতূহলের রূপে ঈশ্বর ছিলেন।

যে সুচারু এবং মর্যাদাপূর্ণ ভাবে অনুষ্ঠানটি পরিচালিত হয়েছিল তা আমাকে অবাক করেছিল। আমি ভেবেছিলাম এটি একধরনের ধর্মীয় অনুষ্ঠান হবে। কিন্তু স্বামী গোবিন্দ দেব গিরি জি মহারাজ জীবনযাত্রার মান উন্নত করার বিষয়ে বললেন। আশু গোয়ালজি দাদা আমাদের অবগত করালেন কিভাবে তেরোটি ভাষায় প্রায় চব্বিশ ঘন্টা ধরে গীতা শিক্ষা বিস্তারের এই বিশাল কর্মযজ্ঞ শুধুমাত্র উৎসাহী স্বেচ্ছাসেবকদের প্রচেষ্টার মাধ্যমে পরিচালিত হয়। এটা শুনে আমি তাজ্জব হয়েছিলাম বললেও কম হবে।

দেরীতে ঘুমানো আর দেরিতে ওঠার অভ্যাস এর কারণে, পরের দিন আমি সকাল সাতটায় পরিকিমরি করে ঘুম থেকে উঠে ক্লাসে লগিন করলাম। এখন নিজেই অবাক হয়ে যাই যখন আমি আমার গ্রুপ কোঅর্ডিনেটর সেবা প্রদানের জন্য অতি উৎফুল্ল ভাবে সকাল পাঁচটায় উঠে পড়ি।

যাইহোক, আমি নিশ্চিত নই কেন বা কিভাবে, ক্লাস শুরু হওয়ার প্রথম কয়েক মিনিটের মধ্যে, প্রশিক্ষক দাদা যখন প্রারম্ভিক প্রার্থনা শুরু করলেন, আমি হঠাৎ একটি অপূর্ব ইতিবাচক অনুভূতিতে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিলাম। সে আরেক ব্যাপার যে 'কাউসাচাণূর'

মূর্ধন্য উচ্চারণ করতে আমার প্রায় এক মাস লেগে গিয়েছিলো।

আমার সেই ক্লাসে দশ এগারো বছরের একটি ছোট্ট মেয়ে ছিল। আমি খুব অবাক হয়ে ছিলাম

যখন আমাদের প্রশিক্ষক দাদা ক্লাস চলাকালীন তাকে 'দিদি' বলে সম্বোধন করলেন। আমার কাছে সেই সময়ে তা খুব অদ্ভুত লেগেছিলো। পরে বুঝতে পেরেছিলাম যে এটি বয়স নির্বিশেষে ব্যক্তির প্রতি সম্মানের জন্য বলা হয়েছিল। খুব ভালো লেগেছিলো সেটা।

ইতিবাচকতার অনুভূতি ছাড়াও, আমার জীবনধারায় প্রায় আমার অজান্তেই ছোট্ট ছোট্ট পরিবর্তন ঘটছিল। যেমন আগে বললাম যে আমি ভোর বেলা উঠতে শুরু করি, একাদশীর উপবাস রাখা শুরু করি এবং আমার খাদ্যাভ্যাসেও পরিবর্তন লক্ষ্য করি।

এই সব ছোট ছোট ঘটনার দরুন আমি আমার ভেতরে এক ধরনের পরিবর্তন অনুভব করতে পারছিলাম।

কিন্তু আমার জীবনে সবচেয়ে বড় পরিবর্তন যেটা হলো, তা হলো, আমি ধীরে ধীরে আমার ক্ষোভ, হতাশা, জীবন যুদ্ধে এক পরাজিত সৈনিক হবার অনুভূতি এবং অজানা ভবিষ্যতের ভয় থেকে বেরোতে শুরু করলাম। আমার জীবনে যা মন্দ, যা দুঃখজনক, তার জন্য দায়ী অন্য কেউ, এমন এক চিন্তাধারা থেকে বেরিয়ে আমার ভাগ্যফলের দায়িত্ব নিতে শিখলাম এর ফলে আমার কাঁধ থেকে যেন এক পাহাড়প্রমাণ বিমর্ষতার বোঝা নেমে গেলো আর আমি নিরানন্দ থেকে আনন্দের পথে চলতে শুরু করলাম।

আমি বুঝতে শিখছিলাম আমার জীবন কতটা মূল্যবান এবং সুন্দর কিন্তু আমি কীভাবে তাকে এক বিমর্ষতা ঘূর্ণিপাকে ফেলে দিয়েছিলাম। এত দিন আমার জীবনের অসংখ্য আশীর্বাদ (ভাল শিক্ষা, স্নেহময় মা বাবা, সফল কর্মজীবন, প্রেমময় সন্তান) কে ভুলে আমি শুধু গুটিকতক মন্দ ঘটনাকে অযথা গুরুত্ব দিচ্ছিলাম।

সমস্ত বিবেচনের মাধ্যমে আমি উপলব্ধি করতে পেরেছিলাম যে আমার আজকের কারণ আমি গতকাল যা করেছি এবং আমি আজ যা করছি তা আমার আগামীকালকে প্রভাবিত করবে।

ভগবদ্গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের সাতচল্লিশতম শ্লোকে বলা হয়েছে

কর্ম্মণ্য-ইবাদিকরাস তে মা ফলেশু কদাচন

মা কর্ম-ফল-হেতুর ভূর মা তে সংগো 'স্তবকর্মাণী

অর্থাৎ নির্ধারিত দায়িত্ব পালন করার অধিকার আমাদের আছে, কিন্তু আমরা সেই কর্মের ফল পাওয়ার অধিকারী নই। নিজেকে কখনই আমাদের কার্যকলাপের ফলাফলের কারণ মনে করবো না এবং নিষ্ক্রিয়তা সাথে যুক্ত হবো না।

আমি কীভাবে আমার ভবিষ্যতকে রূপ দিতে চাই তা আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠছিলো।

আগে আমি অনেক পয়সা খরচ করে



নানারকম হিলিং ওয়ার্কশপ (নিরাময় কর্মশালা)যোগ দিয়েছি, কিন্তু কিছু তাৎক্ষনিক উপকার পাওয়া ছাড়া জীবনে বিশেষ কোনো পরিবর্তন দেখতে পাইনি।

আর এখানে আমি কিছুই বিশেষ করিনি, এমনকি একটি কানাকড়িও খরচ করিনি। শুধু রোজ সকালে যতটা পারি, পবিত্র মন নিয়ে ভগবদ্গীতা পড়ার চেষ্টা করেছি।

আর তার ফলস্বরূপ, এক মাসের মধ্যেই নিজের মধ্যে কি আমূল পরিবর্তন দেখতে পেয়েছি। আমার মন শান্ত হয়ে গেছে, এবং আমি পূর্বের তুলনায় বাহ্যিক ঘটনার দ্বারা কম উত্তেজিত হই। পেশাগতভাবে, আমি আরও স্থিতিশীল এবং জাগতিক বিষয়ে কম আকৃষ্ট হয়েছি। আমি আগের চেয়ে আরও নম্র হয়েছি, এবং আমার রাগ, লোভ, অহংকার, হিংসা এবং অন্যান্য নেতিবাচক আবেগগুলি বেশ কিছু পরিমাণে হ্রাস পেয়েছে।

আমি এইটুকু বুঝেছি যে গীতা আমাদের একটি ভিন্ন দৃষ্টিকোণ দিয়ে বিশ্ব এবং জীবনকে দেখতে শেখায় -

আধ্যাতিক এবং সুস্থ জীবনযাপন করার পদ্ধতি। ফলের আশা দূরে রেখে নির্লিপ্ত ভাবে কর্ম করে যাওয়া।

ব্যর্থতাকে স্বীকার করে পরবর্তী জীবনের দিকে এগিয়ে যাওয়া।ব্যর্থতা থেকে ভয়শুন্য হওয়া।

আত্মবিশ্বাসী হওয়া।

অন্তরের শান্তির গুরুত্ব।

জনকল্যানমুলক কাজ করার ইচ্ছা।

ত্যাগের ও দানের ক্ষমতা।

আমার জীবনে আর একটি অভূতপূর্ব পরিবর্তন যেটা হলো তা আমার পরিচিত বৃত্ত যেন সৎ সঙ্গে ভোরে গেলো। যাদের সাথে যোগাযোগ হলো, তারা সবাই ভগবানের আশীর্বাদ ধন্য। কি নম্র, ইতিবাচক চিন্তা সম্পন্ন, সুন্দর তাদের ব্যবহার। হটাৎ মনে হলো যেন আমি কোনো এক সুন্দর গৃহিয়াশ্রমে চলে এসেছি।

ভগবদ্গীতা সম্পূর্ণরূপে প্রতীকী। এখানে কোনো সত্যিকারের যুদ্ধক্ষেত্র বা যুদ্ধ নেই; যা আছে তা আমাদের মনের মধ্যে যে যুদ্ধ চলছে তার একটি উপস্থাপনা মাত্র। আর গীতার বাণীর সাহায্যে যখন আমাদের মনের নেতিবাচকের ওপর ইতিবাচকের জয় হয়ে, তখনি আমরা খুঁজে পাই, আসল প্রশান্তি।

তবে আমি এটা উপলব্ধি করেছি যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে নিজের ইচ্ছায় পৌঁছনো যায় না, সময়ে হলে তিঁনি আমাদের তার কাছে টেনে নেন। এর ঝলক আমি নিজে অনুভব করেছি।

আমি নিজের জীবনের সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতা থেকে এটা উপলব্ধি করতে পেরেছি যে জীবনকে একটি সুন্দর, শান্ত এবং আন্তরিক সুখের পথের পরিচালিত করার জন্য ভগবদ্গীতার প্রদত্ত্ব জ্ঞান কালজয়ী যা মহাভারতের সময়ে সত্য ছিল, আজও সত্য, ভবিষ্যতেও থাকবে।

- Smt. Ruby Lalla

